Dipanwita Chowdhury, SACT
Department of History, Dumkal College

প্রঃ- গুপ্ত যুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলে অভিহিত করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত?

উঃ- প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই যুগে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চা, ধর্ম— জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। গুপ্তযুগকে তাই 'সুবর্ণ যুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ঐতিহাসিক বার্নেট (Barnett) গুপ্তযুগকে গ্রিসের ইতিহাসের পেরিক্লিসের যুগ, রোমের ইতিহাসের অগাস্টাসের যুগ এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এলিজাবেথের যুগ-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রাজনৈতিক ঐক্য আনয়ন এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্যই গুপ্তযুগ খ্যাত হয়। সাহিত্য ও শিল্পসংস্কৃতি এই যুগকে এক অভাবনীয় বিশিষ্টতা দান করেছে। ভারতীয় ইতিহাসচর্চাতেও দীর্ঘদিন গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণ যুগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ভিন্ন চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে যেখানে সুবর্ণ য়ুগের ধারনাকে Myth বা অতিকথা বলা হয়েছে।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে কোনো সার্বভৌম রাজশক্তির অভ্যুত্থান ঘটেনি, পশ্চিম পাঞ্জাবের কুষাণরা, গুজরাট ও মালবের শকরা এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শকরা এবং উত্তর-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বহু ক্ষুদ্র রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। এই সব রাজ্যগুলির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। এই পরিস্থিতিতে গুপ্তরাজাদের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে গুপ্তরাজরা এক সর্বভারতীয় সার্বভৌম রাজশক্তি ও উন্নত ধরনের সভ্যতার সৌধ রচনা করেন।

গুপ্ত আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারি ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল সংস্কৃত ভাষা। ঐ যুগের সমস্ত লেখগুলি লেখা হয়েছিল ঐ ভাষাতেই। গুপ্তযুগের ধর্মীয় সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র ও মহাকাব্য। উল্লেখ্য-বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও ভাগবৎ পুরাণ গুপ্তযুগে পূর্ণরূপ লাভ করেছিল। গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল। গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা অভাবনীয় উন্নতি করে। স্মৃতিশাস্ত্রগুলিও এই যুগে রচিত বা পরিবর্তিত হয়েছিল। এই সকল গ্রন্থে বিগত কালের ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও দর্শনচিন্তার সমন্বয় দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক-সংহিতা প্রভৃতি গুপ্তযুগের সৃষ্টি।

বিশিষ্ট শাস্ত্রকার ঈশ্বরকৃষ্ণ, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, গৌড়পাদ, ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাকার পক্ষিলস্বামিন, বৌদ্ধ দার্শনিক দিনাগাচার্য এবং বিশিষ্ট বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি, এই যুগেই আবির্ভূত হন। 'মুদ্রারাক্ষস' প্রণেতা বিশাখদত্ত, মৃচ্ছকটিক' প্রণেতা শূদ্রক, 'কিরাতার্জুনীয়ম্' প্রণেতা ভারবি, 'ভট্টিকাব্য' প্রণেতা ভট্টি, 'পঞ্চতন্ত্র' প্রণেতা বিষ্ণুশর্মা, 'দশকুমারচরিত' প্রণেতা দন্ডী, 'শব্দকোষ' বা অভিধান প্রণেতা অমরসিংহ তাঁদের সৃজনশীল রচনা দ্বারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের মধ্যে প্রধান ছিল কাব্য ও নাটক। এযুগের

আবির্ভূত হয়েছিলেন কালিদাসের মতো মহাকবি। মেঘদূত, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, ঋতুসংহার, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ প্রভৃতি কাব্য নাটকে তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান: সাহিত্য ছাড়াও জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানেও ভারতীয় মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। আর্যভট্ট, বরাহমিহির ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। আর্যভট্ট রচিত সূর্য-সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণের মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির রচিত বৃহৎ সংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে গ্রিক ও রোমান জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা হলেন আর্যভট্ট। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হল সূর্যসিদ্ধান্ত ও আর্যভট্টীয়। প্রায় সাময়িক কালের অপর খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ হলেন ব্রহ্মগুপ্ত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল ব্রহ্মাসিদ্ধান্ত। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই যুগে যথেষ্ট প্রসার ঘটে। ধন্বন্তরি ও বাগভট এই যুগেই তাঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি রচনা করেন। সম্ভবত শল্য-চিকিৎসা এই যুগে প্রচলিত ছিল এবং অনেকের মতে শল্যবিদ্যায় পারদর্শী সুশ্রুত গুপ্তযুগেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেনাবাহিনীর সুবিধার্থে এই যুগেই প্রথম পশু চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচিত হয়।

ধাতু বিদ্যাঃ ধাতু বিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত হল দিল্লির নিকটে প্রাপ্ত মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভটি। এছাড়া নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্র নির্মিত বুদ্ধ মূর্তিটি, বিভিন্ন রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এবং সিলমোহরের মধ্যেও ধাতু বিদ্যার উন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

শিল্পকলা: গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে- "The three closely allied arts of architecture sculpture and painting attained an extraordinarily high-points of achievement." গুপ্তযুগের শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সহজ ও স্বাভাবিক গড়ন এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ; হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনাবলিকে অবলম্বন করে ভাস্কররা তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

স্থাপত্যঃ গুপ্তযুগের স্থাপত্যর আলোচনার সুবিধার্থে পর্বত গুহা স্থাপত্য ও মন্দির স্থাপত্য এই দুটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। গুপ্ত আমলে পর্বত গুহা স্থাপত্য প্রধানত বৌদ্ধ ধর্ম তথা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকদের উদ্যোগে তৈরি হত। পর্বত গুহা স্থাপত্যের আবার দুটি দিক আছে যথা-চৈতা এবং সংঘারাম বা বিহার। এই যুগে পূর্ববর্তী স্থাপত্যরীতির চরমবিকাশ ও নতুন রীতির সূচনা দেখা যায়। গুপ্তযুগীয় স্থাপত্য শিল্পের বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায় গুহামন্দির নির্মাণ কৌশলে। পাথর কেটে বৌদ্ধ, জৈন হিন্দু গুহামন্দির স্থাপন এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গুপ্ত আমলে পর্বত গুহা স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় চার জায়গায়, অজন্তা, ইলোরা ঔরঙ্গাবাদ এবং মধ্যপ্রদেশের 'বাঘ'-এ। এই গুহায় পাহাড় কেটে চৈতা ও বিহার নির্মাণ গুপ্ত যুগের অবদান। এগুলির মধ্যে

অজন্তার গুহাগুলি তাৎপর্যমণ্ডিত। ইলোরার ১০নং গুহায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। পর্বত স্থাপত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সংঘারাম বা বিহার। সাধারণত সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য এগুলি নির্মিত হত। তবে চৈত্য বা বিহারগুলির স্থাপত্য কেবল বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রয়োজনেও বিহারগুলি নির্মিত।

এ যুগেই প্রথম পাথর এবং ইটের তৈরি মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও গুপ্তযুগ এক নবযুগ। মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় এবং নাগর রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। এই যুগের আবিষ্কৃত স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হল তিগোয়ার শিবমন্দির, ভূমারার বিষ্ণুমন্দির, সাঁচীর মন্দির, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, ভিতরগাঁওয়ের ইষ্টক নির্মিত মন্দির। ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরটির গড়ন ছিল পিরামিডের মতো। সারনাথে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির গুপ্তযুগের স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। বিখ্যাত শিল্প বিশেষজ্ঞ পার্সি ব্রাউন (Percy Brown) দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরটিকে গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন বলে অভিহিত করেন।

ভাস্কর্য: ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ করা যায়। সারনাথে প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, মথুরায় প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধ, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমুর্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরের অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মূর্তিতে রিলিফের কাজ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে নির্মিত অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উন্নত স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষ্য বহন করে। সেই যুগে নির্মিত অতি দৃষ্টিনন্দন একটি কীর্তি হল 'সাঁচী স্তূপ' (পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণুর মতো দেবতার মূর্তি এযুগের ভাস্কর্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করে।।

এই সময় গন্ধার, মথুরা ও অমরাবতীর ভাস্কর্য শিল্পের সুসমন্বয় লক্ষ করা যায়। ড. নীহার রঞ্জন রায়ের মতে গুপ্তযুগের মূর্তিগুলির মুখমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় উদ্ভাষিত। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের দুটি প্রধান ক্ষেত্র হল মথুরা এবং সারনাথ এবং পূর্বভারতে পাটলিপুত্র। এই তিনটি প্রধান কেন্দ্র ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি, ভিলসা, এরান ও মান্দাসোরে অপ্রধান কিছু শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। মথুরার লাল বেলেপাথরে এবং অনেক সময় ঈষৎ হলুদ বর্ণ চুনাপাথরে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। মথুরা শিল্পে কিছুটা বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও সারনাথের বুদ্ধমূর্তিতে তা ছিল না।

চিত্রকলা: গুপ্ত আমলে চিত্রকলা শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। পাহাড় কেটে গুহা মন্দির নির্মাণে ও মন্দিরে দেওয়াল গাত্রে অঙ্কিত চিত্র সে যুগে চিত্র শিল্পের চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব ও জাতকের কাহিনি ছাড়াও রাজপ্রাসাদের দৃশ্য যেমন-রাজা, রাজকন্যা, রাজপ্রাসাদ এবং পশু, পাখি, ফুল কৃষক, সন্ন্যাসী প্রভৃতির চিত্র এগুলিতে উপস্থিত। অজন্তার গুহাচিত্রের অধিকাংশই এই যুগের সৃষ্টি এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে এই চিত্রগুলি রেনেসাঁসের যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্রগুলির সমতুল্য। বুদ্ধের জীবনী

অবলম্বনে বহু চিত্তাকর্ষক চিত্রও অঙ্কিত হয়। অজন্তার ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহাগুলি মনোরম চিত্রে পরিপূর্ণ। তাছাড়া জলরঙে অঙ্কিত বাঘ এবং ইলোরার প্রাচীর চিত্রগুলি বিশ্ববিখ্যাত। এখানকার ভিত্তিচিত্রগুলি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন ব্যাপক তেমনি বিচিত্র। প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্মীয় জীবন এবং কল্পনা সবই যেন এখানে একাকার হয়ে গেছে। গুপ্তযুগে ধর্মের ক্ষেত্রেও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লক্ষ করা যায়। অনেকের মতে গুপ্তরাজারা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। গুপ্তরাজারা নিজেদের 'পরমভাগবত' বলে অভিহিত করতেন। গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় বিষ্ণু-পত্নী লক্ষ্মীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত দেখা যায়। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের উল্লেখ আছে। এর থেকে মনে হয় স্কন্দগুপ্ত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। মৌর্যরাজ অশোকের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুটা গুরুত্ব হারালেও গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা পুনরায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এই যুগের সাহিত্য, স্মৃতিশাস্ত্রে ও লেখমালায় এর ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার গুপ্তযুগে বহুদিনের ধর্মীয় ধারা পরিণত রূপ পায়, ব্রাহ্মণ্যধর্ম সুসংগঠিত হয়।

ধর্মঃ গুপ্তরাজার শুধু যে বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এমন মনে হয় না। তাঁরা শিবের উপাসনাও করতেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি মুদ্রায় ও লিপিতে পার্বতী, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রতিও গুপ্তরাজাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এককথায়, গুপ্তরাজারা ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর উপাসক। এই যুগে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ভক্তিমূলক ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। হিন্দুসমাজে 'শৈবধর্ম' ও 'ভাগবতধর্ম' দুটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। শিব পূজার সঙ্গে সঙ্গে শিবের মহিষী পার্বতীর পূজারও প্রচলন ছিল। সেই যুগে শক্তিপূজাও প্রচলিত ছিল।

হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও গুপ্তরাজাদের আনুকূল্য লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নাগার্জুন, বসুবন্ধু ও পরমার্থের মতো খ্যাতনামা বৌদ্ধ মনীষীদের আবির্ভাব এযুগেই হয়। নালন্দার মতো বৌদ্ধ মঠগুলি বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। গুপ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। ফা-হিয়েনের বিবরণীতে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মঠগুলি ছিল সে যুগের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ নালন্দার উল্লেখ করা যায়।ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদভাব বজায় ছিল; এই যুগে ধর্ম বিরোধের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

এইভাবে শিল্প ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ও সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে অনেকেই গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণ যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক ঐক্যবোধ ও শৃঙ্খলা, আর্থিক সমৃদ্ধি, সামাজিক সমন্বয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবজাগরণ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে তাঁরা গুপ্তযুগের ভারতকে 'সুবর্ণ যুগ' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

প্রধানত সভ্যতা সংস্কৃতি অভাবনীয় অগ্রগতির দিকে লক্ষ রেখেই এল. ডি. বার্নেট গুপ্ত যুগকে প্রাচীন গ্রিসের 'পেরিক্লিসের যুগ'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এছাড়া গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণযুগ' ও 'ধ্রুপদী যুগ' বলে অভিহিত করার রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে চলে আসছে। কয়েক দশক ধরে বেশ কিছু পণ্ডিত যথা-রোমিলা থাপার, আর. এস. শর্মা, ডি. এন. ঝা, বি. এন. মুখার্জি প্রমুখ গুপ্তযুগকে সুবর্ণ যুগ বলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

বিতর্কঃ গুপ্তযুগের সার্বিক উন্নতির যে চিত্র সমসাময়িক তথ্য সূত্রে পাওয়া যায় তার। ভিত্তিতেই রণবীর চক্রবর্তীর মতো আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অবশ্য ভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছেন। বলা হয়েছে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী শিল্প-বাণিজ্য ও নগরায়ণের চরম বিকাশের যুগ। কিন্তু খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা দেয় শিল্প বাণিজ্য মন্দা মুদ্রার অভাব, নগরবসতির ক্রমাবনতি, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি পশ্চাদপদতার লক্ষণ। গুপ্তযুগে বর্ণবৈষম্যের তীব্রতা অন্যান্য তথ্য থেকেও সমর্থিত নয়। এই যুগের স্মৃতি গ্রন্থগুলি থেকে বোঝা সম্ভব হয় যে একজন শূদ্রের হাত থেকে একজন ব্রাহ্মাণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না। এছাড়া গুপ্তযুগের সমাজব্যবস্থায় চণ্ডালেরা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত ছিল। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণে।

গুপ্তযুগে নারীর সামাজিক মর্যাদা সংকুচিত ছিল। নারী ছিল পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তির মতো। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বিধবাদের কুমারীব্রত পালনের কঠোরতা নারীর মর্যাদা হ্রাস করেছিল। স্ত্রী জাতির এই অবমূল্যায়ন তথাকথিত সুবর্ণযুগের ছবির সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলার বিরুদ্ধে যেসব পণ্ডিত আপত্তি তুলেছেন তাঁদের প্রধান অভিযোগ হল এযুগের সমাজব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের মতো শোষণমূলক ব্যবস্থার প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটেছিল। সমকালীন লেখমালা থেকে জানা যায় যে জমি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই জমির সঙ্গে যুক্ত কৃষকেরাও হস্তান্তরিত হত। ফলে কৃষক সম্প্রদায় এর্থনীতির শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে বাক্তিস্বাধীনতা ও মানুষের। অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

আপাত দৃষ্টিতে গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে চিত্র ফুটে ওঠে তার বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। সমৃদ্ধির ফল লাভ করেছিল উচ্চাকোটির মানুষ। তবে সবাই এর সুফল লাভ করেনি। ভারত-রোম বাণিজ্যের অবনতি দেশের অর্থনীতিকে প্রচণ্ড আঘাত করে। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নগরের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি দেখা গেলেও গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষের সার্বিক চিত্র তা ছিল না। আনুমানিক ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ প্রথম কুমারগুপ্তের পর থেকে স্বর্ণমুদ্রায় খাদের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। চিনা পর্যটক ফা-হিয়েনের প্রদত্ত বিবরণের আলোকে বলা যায় যে দৈনন্দিন সাধারণ কেনাবেচার জন্য তখন কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্ত গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সামগ্রিক

অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ নেই। সেইজন্য সুবর্ণযুগের ধারণা কষ্টকয়িতই থেকে যায় কারণ সুবর্ণযুগের আবশ্যিক লক্ষণ হল জনসাধারণের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানোন্নয়ন।।

গুপ্ত আমলের সাহিত্য ও শিল্পকলার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করলেও স্পষ্টতই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ চোখে পড়বে। এই যুগে সমস্ত নাটক ও কাব্য রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। নাটকের বিষয়বস্তু রাজন্যবর্গের যুদ্ধযাত্রা ও আমোদ প্রমোদ। সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃত অবহেলিত থাকে। উচ্চবর্ণের মানুষ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে। সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল প্রাকৃত এবং তা প্রায় উপেক্ষিতই থেকে যায়। যদি সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবনের কথাই বলা যায়-তা হলে বলতে হয় যে, কুষাণযুগেও এর পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল-গুপ্তযুগে নয়। একথা অনস্বীকার্য যে, অশোকের সময় থেকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা কিছুটা গ্রান হয়ে পড়েছিল মাত্র এবং গুপ্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পুনরুজ্জীবিত কখনোই বলা চলে না। গুপ্তযুগের অধিকাংশ শিলালেখ সংস্কৃত ভাষায় মনোহর ছন্দে রচিত। হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তি উন্নত ভাষাশৈলীর পরিচায়ক। গুপ্ত রাজগণের মুদ্রাতেও সংস্কৃত লেখ উৎকীর্ণ। এই মুদ্রা-লিখন রীতিমতো ছন্দোবদ্ধ।

গুপ্তযুগে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারকেরা চিনে গিয়ে সেখানে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। অপরদিকে, চিন থেকে বৌদ্ধ প্রচারক ও পর্যটকেরা ভারতে আসেন। মালয় দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বালি, আন্নাম, বোর্নিও প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্র ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃত হয় এবং বিভিন্ন ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। অজন্তার গুহাচিত্র থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভারত ও পারস্যের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কুষাণ শাসনকালে রোমের সাথে ভারতের যে সম্বন্ধ হয়েছিল তা গুপ্তযুগেও বজায় ছিল। এবং বিভিন্ন সময়ে এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয়। এই সমস্ত দেশে ভারতীয় ধর্ম, রীতি-নীতি, ভাষা, লিপি সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হয়। ওপরের বিস্তৃত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তা হল, দীর্ঘ প্রায় একশো বছর ধরে গুপ্তযুগকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সুবর্ণযুগ' বলে অভিহিত করার যে রেওয়াজ চলে আসছে তা ঠিক নয়। ইতিহাসবিদ ডি. এন. ঝা গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণযুগ' বলার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেছেন। তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, এটা 'মিথ' (অতিকথন) ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে 'সুবর্ণযুগ' অভিধার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও গুপ্তযুগে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প-কলা, বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তার মধ্যে যে অভূতপূর্ব সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনায় কম। বস্তুত সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ডে বিচার করলে কোনো সভ্যতা বা যুগকেই ‘সুবর্ণ’ আখ্যা দেওয়া যায় না।